সপ্তম অধ্যায়

গদ্যসাহিত্য ঃ

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যেও প্রথম পদ্যের উদ্ভব এবং পদ্যেই সাহিত্যরচনার শুরু; গদ্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত পরের যুগে। বৈদিক সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ সংহিতাযুগে গায়ত্রী, অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দে রচিত পদ্যের সার্বিক প্রাধান্য এবং সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের স্থান সমধিক। ছন্দোবন্ধন, গীতিময়তা ও সুবোধ্যতা গুণে পদ্য সহজেই শ্রোতার চিত্তাকর্ষক হয়। যখন লিখন-পদ্ধতির প্রচলন হয়নি, তখন মৌখিক ভাষায় রচিত পদ্যই ছিল প্রকৃত সাহিত্য। বৈদিক সংহিতা, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, অভিধান, কাব্য অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যের অধিকাংশই আদ্যন্ত পদ্যে রচিত। নাটক, চম্পূ, কথাসাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের সমান মর্যাদা; আবার কখনও কখনও পদ্য গদ্যের সংযোজক। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যে অতি প্রাচীন কালেই গদ্যের উদ্ভব এবং সামগ্রিক উৎকর্ষের বিচারে গদ্যের স্থান পদ্য অপেক্ষা ন্যূন নয়[১]।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য যেমন অতি প্রাচীন, তেমনি পদ্যের ন্যায় বিশাল, ব্যাপক ও বহুমুখী ধারায় অনুশীলিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় সংস্কৃত গদ্যের প্রাচীনতম রূপটি পাওয়া যায়। অথর্ববেদের এক-ষষ্ঠাংশ গদ্যে রচিত। তবে অথর্ববেদের গদ্য যজুর্বেদের গদ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরবর্তী। যজ্ঞের ব্যাখ্যান ও বর্ণনামূলক ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি (কতিপয় গাথা ব্যতীত) সামগ্রিকভাবে গদ্যে রচিত। বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় পর্বে গদ্য ও পদ্য সমমর্যাদা লাভ করেছিল। রচনাশৈলীর বিচারে ব্রাহ্মণের গদ্য সংহিতার মন্ত্র ও সূত্র সাহিত্যের মধ্যবর্তী। সংহিতার সীমিত গদ্য এবং ব্রাহ্মণের সার্বিক গদ্যরীতি সরল ও অনাড়ম্বর, বাক্‌শৈলী ঋজু এবং উপমা-রূপকাদির ব্যবহার বিশেষ সংযত। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণগুলি একই সময়ের রচনা নয়। অর্বাচীন কালের ব্রাহ্মণগুলিতে ধ্রুপদী গদ্যের সূচনা পরিলক্ষিত হয়; আরণ্যকের গদ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণের গদ্যের তুল্য রচনা। যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণের গদ্যরীতি সরল ও সন্নদ্ধ, সাহিত্য-সুষমায় শ্রুতিসুখদ ও মনোগ্রাহী; উপনিষদেও সচরাচর এই রচনারীতি অনুসৃত। উপনিষদের গদ্য ও ধ্রুপদী গদ্য উভয়ের মধ্যবর্তিরূপে সূত্রসাহিত্যের গদ্যকে নির্দেশ করা যায়। সামগ্রিক বিচারে বৈদিক গদ্যরীতি ঋজু, সংহত, সহজবোধ্য, বাক্যরীতি সাবলীল; সন্ধির আতিশয্য ও সমাসের ঘটা না থাকায় বাক্যগঠন বেশ আঁটোসাটো অথচ স্বচ্ছন্দ।

Scanned with CamScanner

দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কাব্য দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রব্যকাব্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গদ্যকাব্য অন্যতম। গদ্যরচনাই হল কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি। তাই বলা হয়ে থাকে—"গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।" গদ্যকাব্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে দণ্ডী বলেছেন—"অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্[১]।" অর্থাৎ পাদবিহীন ও অর্থসমন্বিত পদসন্নিবেশই গদ্য। বিশ্বনাথও ছন্দোবদ্ধ পাদবিহীন বৃত্তবন্ধকে গদ্য আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন—"বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্[২]।" এই গদ্যকাব্যের আবার বিভিন্ন অবান্তর ভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—কথা, আখ্যায়িকা, খণ্ডকথা, পরিকথা, এবং কথালিকা। তাই অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

"আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথালিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা।।"

গদ্যকাব্যের এই পাঁচটি বিভাগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কথা ও আখ্যায়িকা। অগ্নিপুরাণে, রুদ্রটের কাব্যালংকারে, ভামহের কাব্যালংকারে, হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে কথা ও আখ্যায়িকার স্বরূপ নিরূপিত হয়েছে।

ঠিক কবে কোন্ সময় থেকে সংস্কৃত গদ্যকাব্যের সূচনা—এ বৃত্তান্ত আজও রহস্যাবৃত। পণ্ডিতদের অনলস অধ্যবসায় এ বিষয়ে আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। যজুর্বেদসংহিতা থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে গদ্য রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈদিক কর্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত নির্দেশগুলি গদ্যে রচিত। অথর্ববেদেও কিছু কিছু গদ্য রচনা পাওয়া যায়। বেদাঙ্গ এবং সূত্রসাহিত্য সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনার পরিচয় বহন করে। পাণিনি-ব্যাকরণের বার্তিকসূত্রে কাত্যায়ন আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সাবলীল গদ্যরচনাশৈলী পরিলক্ষিত হয়। মহাভাষ্যকার 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' এবং 'ভৈমরথী' নামে তিনটি গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু এই গদ্যকাব্যগুলি আজ কালগর্ভে বিলীন বলে এদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 'বৃহৎকথা' নামটির সঙ্গে 'কথা' শব্দটি যুক্ত আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' শব্দ দুটি অতি প্রাচীন। ভোজ তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশে[৪] বররুচির 'চারুমতী' ছাড়াও 'মনোবতী' ও 'শাতকর্ণীহরণ' নামক দুটি গদ্যরচনার কথা উল্লেখ করেছেন। সোমিলের 'শূদ্রককথা', শ্রীপালিতের 'তরঙ্গবতী', ধনপালের দ্বারা উল্লিখিত 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী'[৫] প্রভৃতি গদ্যকাব্য আজ নামমাত্রে পর্যবসিত। আলংকারিক ভামহ কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ নির্দেশ করেছেন।[৬] দণ্ডী উভয় গদ্যকাব্যকে

Scanned with CamScanner

একই শ্রেণীভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন—"তৎ কথাখ্যায়িকাত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা"। বাণভট্ট স্বরচিত হর্ষচরিতে ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যরচনার প্রশংসা করেছেন— "ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে।" এই সকল উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ঊষর মরুতে দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে নি। এই গদ্যকাব্য রচয়িতাদের লেখনীতে যে সুবর্ণযুগ সূচিত হয়েছে তার পূর্বেও নিশ্চয়ই গদ্যকাব্যের একটা প্রস্তুতি পর্ব ছিল। পূর্বসূরীদের সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণ গদ্যকাব্যের সুদৃশ্য সৌধ নির্মাণ করেছেন।

Scanned with CamScanner

দণ্ডী : গদ্যসাহিত্যে ত্রয়ী প্রতিভার অন্যতম দণ্ডী। অবন্তিসুন্দরী কাব্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ে লেখক বলেছেন—কবি দামোদরের (পাঠান্তরে ভারবির) তিন পুত্রের অন্যতম মনোরথ; মনোরথের পুত্রচতুষ্টয়ের কনিষ্ঠ বীরদত্ত; কাঞ্চীনিবাসী উক্ত বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র দণ্ডী। কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম হয়। প্রাচীন টীকাকার ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ লেখক সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে—দণ্ডীর পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস ছিল বর্তমান গুজরাটের আনন্দপুরে, তারপর তাঁরা প্রাচীন কাঞ্চী (বর্তমান দক্ষিণভারতের কাঞ্চীপুর) নগরে বসতি করেন। বাল্যকালেই দণ্ডীর মাতাপিতৃবিয়োগ ঘটে[১০]। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে কাঞ্চীদেশ আক্রমণ করেন। সেই সময় ঐ রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার কারণে দণ্ডী দেশ ত্যাগ করে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন এবং পরবর্তীকালে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা যখন হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন, তখন কবি স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে ঐ রাজসভায় (৬৩০-৬৬৮ খ্রী.) সম্মাননীয় পদ লাভ করেন[১১]। কিন্তু উক্ত আত্মপরিচিতি থেকে পূর্বাপর সাহিত্যিকগণের স্বকীয় পরিচয় প্রসঙ্গের মত ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য।

দণ্ডী এক না একাধিক[১২]? দণ্ডী কি কবির ব্যক্তিনাম[১৩]?—ইত্যকার প্রশ্নের সমাধানে ঐতিহাসিক গবেষণার ভিত্তিতে আধুনিক বিদ্বৎসমাজ কিছু তথ্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আলঙ্কারিক রাজশেখরের নামে সঙ্কলিত একটি শ্লোকে দণ্ডিরচিত জনপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধত্রয়ীর উল্লেখ করা হয়েছে[১৪]। এই উক্তি অনুসারে অনেকের অনুমান দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ রচয়িতা দণ্ডী এক ব্যক্তি এবং তাঁর তৃতীয় গ্রন্থটি হল 'অবন্তিসুন্দরীকথা'[১৫]। অবশ্য এতদ্‌বিষয়ক সমস্ত পণ্ডিতী আলোচনায় ঐক্য অপেক্ষা বৈপরীত্যই বেশি। আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে কাব্যাদর্শে আলঙ্কারিক সমালোচক দণ্ডী যে সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দশকুমারে সাহিত্যিক দণ্ডী সেই আদর্শ বহু ক্ষেত্রে উল্লঙ্ঘন করেছেন; কাব্যপ্রসিদ্ধ 'দশগুণ' আলোচনায় আলঙ্কারিক দণ্ডী বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির পারস্পরিক বৈষম্য অনুযায়ী উৎকৃষ্ট সাহিত্যের আদর্শ, অলঙ্কার বিন্যাসের শৈলী, কাব্যদোষ ও অন্যান্য বিষয়ে যেসব সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর স্বকীয় সাহিত্যকৃতিতে সেইসব মতাদর্শ সর্বদা সম্মানিত বা সুরক্ষিত নয়, যেমন সম্ভোগের বর্ণনায় যে বাৎস্যায়নী প্রেরণা তাঁর সাহিত্যে কার্যকর, স্বকীয় কাব্য-সমালোচনার বিচারে তা

Scanned with CamScanner

গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। অবশ্য একই ব্যক্তির চিন্তাধারায় সমালোচক ও সাহিত্যিকের মতাদর্শঘটিত প্রশ্নে বৈপরীত্য ঘটা অসম্ভব নয়; সুতরাং আলঙ্কারিক দণ্ডীর সাহিত্যসর্জনায় কবিসত্তার প্রভাবে সমালোচকসত্তা আচ্ছন্ন হলেও তাকে আমরা আদর্শের বিরোধ বলে মানতে রাজী নই। অথবা যাঁরা মনে করেন কাব্যাদর্শ দণ্ডীর প্রবীণ বয়সের রচনা এবং দশকুমার অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের রচনা, তাঁদের দৃষ্টিতে বিচারিত আলোচ্য সমস্যার এই সরল সমাধানকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না।

দণ্ডীর জীবৎকাল সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন হলেও কতিপয় বিষয় বিবেচ্য—কাব্যাদর্শে কালিদাসের শ্লোকাংশ (লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি) উদ্ধৃত এবং মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত 'সেতুবন্ধ' নামক কাব্যের উল্লেখ আছে। (মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং—কাব্যাদর্শ ১।৩৪)। রাজতরঙ্গিণীর উক্তি অনুসারে সেতুবন্ধের রচয়িতা প্রবরসেন ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীরে রাজত্ব করতেন। কাব্যাদর্শে কথা-আখ্যায়িকা সম্পর্কিত আলোচনা পাঠে মনে হয় দণ্ডী তাঁর আসন্ন পূর্ববর্তী আলঙ্কারিক ভামহের মতের সমালোচনা করে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। ভামহের কাল আনুমানিক ৭ম শঃ। কানাড়ী ভাষায় রচিত অমোঘবর্ষের (৮১৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি) 'কবিরাজমার্গ' গ্রন্থে দণ্ডীর প্রভাব স্পষ্ট। কাব্যাদর্শে বর্ণিত রাজবর্মা সম্ভবতঃ পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মার (৬৯০-৭১০ খ্রী.) প্রতিভূ। দশকুমার ও কাদম্বরীর রচনাশৈলীর তুলনামূলক বিচারে নিঃসন্দেহে প্রতিভাত হয় যে দণ্ডী বাণের সমসাময়িক। সিংহলী ভাষায় রচিত 'সিয়বসলকর' (স্বভাষালঙ্কার—৯ম শতকের মধ্যভাগ) কাব্যাদর্শের আধারে রচিত। 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' কোষকাব্যে সঙ্কলিত বিজ্জকা (নামান্তরে বিজয়া) রচিত শ্লোকে দণ্ডিরচিত কাব্যাদর্শের একটি উক্তি প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত[২৬]। সুতরাং উপরোক্ত প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনা করে ৬৫০-৭৫০ খ্রী. পর্যন্ত দণ্ডীর কাল হিসাবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যায়। কাব্যাদর্শে মহারাষ্ট্রীকে প্রকৃষ্ট প্রাকৃত ভাষারূপে নির্দেশ, বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন, দশকুমারে অন্ধ্র, কলিঙ্গ, কাবেরীপত্তন প্রভৃতি স্থানের কাহিনী বর্ণনা এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রসঙ্গ থেকে অনেকে এই লেখককে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

Scanned with CamScanner